ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 218- 224
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.198

সাদা-কালোর বাইরে: নন-বাইনারি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

বসুন্ধরা গাঙ্গুলি, *সহকারী অধ্যাপক, সুভাষচন্দ্র বসু শতবার্ষিকী কলেজ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.08.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the historical context of non-binary identities and examines their relationship with society and the world. It seeks to understand why societies tend to prioritize binary thinking and how this tendency leads to various forms of gender-based discrimination. The central focus of the paper is to understand the struggle of the individuals from the LGBTQIA+ community.

Ancient Indian society often emphasized hetero-normative, reproduction-centered relationships. But if we look deeper, we can find that there are plenty of references also in texts like the *Ramayana* and *Mahabharata* where diverse sexual orientations, same-sex relationships, and gender fluidity have been mentioned. This paper attempts to address objections raised against such identities and try to defend them by providing textual evidence from Ancient Indian literature.

Keywords: LGBTQIA+ identities, Gender discrimination, Contemporary queer perspectives, Ancient India texts, Gender fluidity

সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ মানুষের সাথে বিভিন্ন কারনে বৈষম্যমূলক আচরণ করে থাকে। সে উন্নত দেশই হোক বা উন্নয়নশীল দেশ, বৈষম্যের মতো সামাজিক ব্যাধি সবদেশেই বর্তমান। এ আমাদের সমাজের এমন এক অসুখ যার বিরুদ্ধে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, অর্থ, দেশ ইত্যাদি নানা কারণকে উপলক্ষ্য করে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়ে থাকে।

বৈষম্য কি? বৈষম্য একধরনের আচরণ। নেতিবাচক ও অযৌক্তিক এক আচরণ। একটা বিশেষ আচরণ মানুষ হঠাৎ করে একদিন করে বসে না। আমাদের প্রত্যেকটা আচরণের পিছনে কিছু কারণ থাকে, কিছু বিশ্বাস, মনোভাব কাজ করে। তাই বৈষম্যকে বুঝতে গেলে আমাদের আগে স্টিরিওটাইপ বা বাঁধাধরা ধারণা ও প্রেজুডিস বা পূর্বধারণাকে বুঝতে হবে। এগুলোই বৈষম্যমূলক আচরণের পথ তৈরি করে দেয়। স্টিরিওটাইপ হচ্ছে কিছু বাঁধাধরা ধারণা যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই থাকে। কিভাবে তৈরি হয় এই স্টিরিওটাইপ? মানুষ যখন বড় হয়ে ওঠে তখন তার আশেপাশের পরিবেশ, সমাজই তার মধ্যে এই ধারণাগুলি গেঁথে দেয়। মানুষ এগুলো গ্রহণ করে এবং সেই গ্রহণ করাটি খুব একটা বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে হয় না। স্টিরিওটাইপ ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটোই হতে পারে। কয়েকটা উদাহরণ নিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। যেমন পশ্চিম বাংলার বাইরে বেশিরভাগ বাঙালিরা একটি ধারণা পোষণ করে যে বাঙালি মাত্রই মাছ খায় ও সংস্কৃতিমনস্ক হয়। এখন এই ধারণা তারা সকল বাঙালির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করে অর্থাৎ এখানে সাধারণীকরণের ফলে যা হয় তা হল ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলো এখানে আর ধরা পড়ে না। এমন তো নয় যে আপামর বাঙালি জনগণ সবাই মাছ খেতে দারুণ ভালোবাসে কিন্তু সব বাঙালির ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি তখন প্রযোজ্য হয়ে যায়। স্টিরিওটাইপ নেতিবাচকও হয়। নেতিবাচক স্টিরিওটাইপ এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়-এমন

ধারণা আছে যে বয়স হয়ে গেলে মানুষ দুর্বল ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এখন সকল বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেই এই ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়। স্টিরিওটাইপ প্রেজুডিসে পরিণত হয় যখন মানুষের মনের মধ্যে থাকা ধারণা বা বিশ্বাসগুলো তার মনের মধ্যে এক রকমের নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দেয়। আগের উদাহরণটির সূত্র ধরেই বলা যাক। কারো এটা ধারণা বা বিশ্বাস যে বয়স হলে মানুষ দুর্বল ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এখন এমন একটা সময় আসে যখন এই ধারণাটাই তার মধ্যে এক বিরূপ অনুভূতির সৃষ্টি করে। বয়স্ক মানুষকে কাজ করতে দেখলেই সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে যে কাজটি ঠিকঠাক হবে না বা এই কাজের জন্য বয়স্ক ব্যক্তিটিকে ভরসা করা যায় না। অর্থাৎ বয়স্ক মানুষের কাজ করাটাকে সে ভালোভাবে নিতে পারে না। এখানে কোনোরকম বিচার ছাড়াই মানুষটি এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়। এরপর যদি এরকম কোন অবস্থা তৈরি হয় যেখানে বয়স্ক মানুষের প্রতি এই যেখানে নেতিবাচক মনোভাব এর বশবর্তী হয়ে ব্যক্তিটি কোন বয়স্ক মানুষকে তার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে তখন সেটা হয়ে যাবে বৈষম্য। এখানে বয়স্ক মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হল শুধুমাত্র এই কারনে যে তিনি বয়স্ক। অন্য আর কোনো কিছুই এখানে বিবেচ্য হল না। প্রেজুডিস বৈষম্য এ পরিণত হল তখনই যখন তা মনোভাব থেকে আচরণে রুপান্তরিত হল এবং যা সরাসরি অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলল। আমার মতামত বা নেতিবাচক মনোভাব আমার মনের মধ্যে আছে এবং কোনোভাবেই প্রকাশ পাচ্ছে না তখন তা বাইরের মানুষ এর ক্ষতি করছে না। কিন্তু যখন তা আচরণে বদলে যাচ্ছে তখনই তা বৈষম্য হয়ে উঠছে ও মানুষকে প্রভাবিত করছে।

বিভিন্ন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য অন্যতম। লিঙ্গ বৈষম্যের ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তার লিঙ্গের ওপর ভিত্তি করে অবমূল্যায়ন করা হয় এবং সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয় না। এটি সমাজে পুরুষদের, মহিলাদের ও যারা পুরুষ ও মহিলা এই বিভাজনের নিজেদেরকে চিহ্নিত করতে পারেন না সেই মানুষগুলোর প্রতি ভিন্ন আচরণ করে এবং সকলকে সমমর্যাদা প্রদান করে না। বৈষম্যের শিকার ক্ষেত্র বিশেষে একজন পুরুষ ও নারী যেমন হয়ে থাকেন, তেমনই সেই সব মানুষ যারা নারী পুরুষ এই তথাকথিত বিভাজনের মধ্যে পরেন না তারাও খুব বেশি রকম ভাবেই হয়ে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এই মানুষগুলোকে আজ এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেকে এক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গ ভুক্ত মানুষ বলে থাকেন। কিন্তু তৃতীয় লিঙ্গভুক্ত মানুষ বললে যেন একপ্রকারের ক্রমবিন্যাস চলে আসে এবং প্রশ্ন ওঠে প্রথম ও দ্বিতীয় তাহলে কারা? তাই তৃতীয় লিঙ্গ কথাটি ব্যবহার না করে আমরা তাদের এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় হিসাবেই অভিহিত করব।

এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় কারা?

এখানে 'এল' দ্বারা বোঝানো হয় লেসবিয়ান। লেসবিয়ান হলেন সেই নারী যিনি অন্যান্য নারীদের প্রতি আবেগগত বা যৌনভাবে আকৃষ্ট হন। 'জি' দ্বারা বোঝানো হয় গে একজন পুরুষকে যিনি একই লিঙ্গের পুরুষের প্রতি আবেগগত বা যৌনভাবে আকৃষ্ট হন। 'বি' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় সেই ব্যক্তিদের যারা বাইসেক্সুয়াল অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যিনি পুরুষ এবং নারী উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'টি' শব্দটি প্রতিনিধিত্ব করে ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের যেখানে একজন ব্যক্তি যার লিঙ্গ পরিচয় জন্মের সময় নির্ধারিত যে লিঙ্গ তার সাথে মেলে না। 'কিউ' বা 'ক্যুইর' একটি শব্দ যা সেই সব লিঙ্গ পরিচয়গুলির জন্য ব্যবহার করা হয় যেগুলি প্রচলিত লিঙ্গ পরিচয়ের সাথে মেলে না। 'ইন্টারসেক্স' বলতে বোঝানো হয় সেই সব ব্যক্তিদের যারা যে শারীরিক লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যে জন্মগ্রহণ করেন, যা পুরুষ বা নারীর তথাকথিত সাধারণ সংজ্ঞার সাথে মেলে না। 'এ' হল এসেক্সুয়াল হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন না। এর পরে '+' - প্লাস চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে অন্যান্য যৌন লিঙ্গ পরিচয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে যা বিশেষভাবে এই সংজ্ঞার মধ্যে আসছে না।

এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকেই নন-বাইনারী মানুষ হিসাবে নিজেদেরকে প্রকাশ করে থাকেন ও জগতকেও সেই দৃষ্টিতে দেখার কথা বলেন। আসলে মানুষ তার আশেপাশের জগতকে বিভিন্ন ভাবে বোঝার চেষ্টা করে, এই বিপুল সৃষ্টির অর্থ খোঁজার চেষ্টায় নানান ব্যাখ্যা প্রদান করে। সেই আদিমকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মানুষের সেই চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই জগতকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই বেশির ভাগ মানুষ যে পদ্ধতিটির আশ্রয় নিয়ে চলে তা হল বাইনারি দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কাছে জগতটা সাদা-কালো, ভাল-মন্দ, গরীব-বড়লোক, সমকামী-বিষমকামী এইরকম দ্বিধা বিভক্ত। মানুষের এই দ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেবার পিছনে কারণ হল এখানে বিশেষ বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় না। জটিলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় না। সাদা কালোর মাঝে

যে একটা গ্রে শেড আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয় না। এটার সুবিধা এই যে, এটা মানুষকে চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল স্প্লিটিং বা বিভাজন করে ফেলা। এটি হলো মানুষের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা যার মাধ্যমে মানুষ অজান্তেই কোনো ব্যক্তি, ধারণা বা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ ভালো বা সম্পূর্ণ খারাপ এই দ্বিবিভাজনের মধ্যে ফেলে বিচার করে থাকে। এর পরেই যে প্রশ্নটা আসে তা হল মানুষ কেন বিভাজন করে? এর উত্তরে বলা যায় মানুষ 'অ্যাম্বিভ্যালেন্স' বা দ্বিমুখী অনুভূতির অভিজ্ঞতা পছন্দ করে না। মনোবিজ্ঞানে অ্যাম্বিভ্যালেন্স বলতে বোঝায় এমন এক মানসিক অবস্থাকে যেখানে একজন ব্যক্তি একই সময়ে একই বিষয়ের প্রতি দুরকম বিরোধী অনুভূতি অনুভব করে। যেমন ধরা যাক একজন মানুষের কর্মক্ষেত্রে তার এক সহকর্মীর সাথে তার ঝামেলা হল। এখন এটা সেই মানুষটার জন্য সুবিধাজনক যে যার সাথে ঝামেলা হল তাকে একজন খারাপ মানুষ বলে দেগে দেওয়া। এখন যদি সেই মানুষটা তাঁর অন্য দিক গুলো বিবেচনা করতে যান তাহলে দেখবেন তিনি যতটা খারাপ মানুষ বলে তাকে দেগে দিচ্ছিলেন তিনি হয়ত ততটাও নয়। এই বিবেচনার ফলে যা হবে তা হল তার মধ্যে এক দন্দ্বের সৃষ্টি করবে যে লোকটা তাহলে আদতে ভাল না খারাপ? একই বিষয়ে যদি দুরকম জিনিস মনে হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে তা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এই জটিলতা মানুষ এড়াতে চায়। তাই তার কাছে খোলা থেকে বিভাজনের পথই। কিন্তু এই বিভাজন এবং দ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যেটা হয় তা হল জগতটাকে খুব একপেশে দৃষ্টিতে দেখা হয়ে যায়। অনেক সূক্ষ্ম জায়গা থাকে যা হয়তো আমাদের বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন ছিল সেগুলো বাদ পড়ে যায়। পুরো ছবিটা দেখা হয়ে ওঠে না। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলো যারা নিজেদের নন বাইনারী বলে চিহ্নিত করে থাকে তাদের খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এই মানুষগুলির সংগ্রামকে বোঝার আগে আমাদের দুটি বিষয়কে একটু ভালো ভাবে বুঝতে হবে তা হল সেক্স ও জেন্ডার এর মধ্যে পার্থক্য। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি জৈবিক লিঙ্গ ও পরের টিকে সামাজিক লিঙ্গ। সেক্স বলতে সাধারণত বোঝানো হয় যা প্রকৃতি প্রদত্ত, জৈবিক একটা বিষয়। আমাদের সমাজে একজন ব্যক্তি পুরুষ না নারী তা ঠিক করা হয় তাদের মধ্যে থাকা কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। অপরদিকে, জেন্ডার এর ধারনা অনেকটাই সমাজের গড়ে দেওয়া। এক শিশু জন্মানোর পরে সেখানকার সমাজ, সংস্কৃতি ঠিক করে দেয় সে কীভাবে আচরণ করবে, কি ভূমিকা পালন করবে, কি করবে না ইত্যাদি এবং তার মধ্যে থেকেই সে নারী, পুরুষ হয়ে ওঠে।

সেক্স ও জেন্ডার যে এক বিষয় নয়, সে না হয় বোঝা গেল। কিন্তু প্রশ্ন হল সমস্যাটা তাহলে ঠিক কোথা থেকে শুরু হচ্ছে? সমস্যাটা হচ্ছে এই দুটো যে আলাদা এটা সমাজের বেশিরভাগ মানুষই বুঝতে পারেন না এবং তারা মনে করেন একজন মানুষের জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গ একেবারে মিলে যাবে অর্থাৎ একজন নারী শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সে নারীসুলভ আচরণ করবে এবং যে পুরুষ শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সে পুরুষসুলভ আচরণ করবে। নারী ও পুরুষের এই দ্বৈত বিভাজনে পৃথিবীর সকল মানুষই সুন্দরভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, জটিলতা কিছু তৈরি হবে না। কিন্তু বাস্তব চিত্র তা নয়। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা এই দ্বৈত বিভাজনে পড়েন না। এমন দেখা যায় যে, হয়তো নারী শরীরের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি পুরুষসত্তার সাথে নিজেকে একাত্মবোধ করেন এবং এর উল্টোটাও হয়ে থাকে। এখান থেকেই শুরু হয় সমস্যা। সমাজের দ্বৈত বিভাজনের মধ্যে খাপ খাওয়াতে না পারা মানুষগুলোর জীবন নেমে আসে অন্ধকার। তাদের অস্তিত্বই গভীর সঙ্কটের মুখে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে জুডিথ বাটলারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার 'জেন্ডার ট্রাবল' বই তে বলেন, শুধু জেন্ডার নয়, সেক্স এর ধারনাও সমাজই তৈরি করে দেয়। নারী-পুরুষের যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য সেগুলোকে সমাজ একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি থেকেই মূল্যায়ন করে। আমরা জৈবিক লিঙ্গের কথা বলি, দাবী করি এটা প্রকৃতি প্রদত্ত। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে বোঝা যায় এগুলোও তৈরি হয় সংস্কৃতির প্রভাবে, ভাষার ব্যবহারে আর ক্ষমতার নিয়মে। যেমন ধরা যাক একটি ছেলে বা মেয়ে জন্মেছে। যে মুহূর্ত থেকে সে জন্মালো সেই মুহূর্ত থেকে তার জন্য কিছু কিছু বিষয় স্থির হয়ে গেল। ছেলে বাচ্চা হলে তার জন্য মানুষজন নীল রঙের জিনিস নিয়ে যেতে শুরু করলেন, মেয়েদের জন্য পিঙ্ক। কেননা নীল ছেলেদের রঙ আর পিঙ্ক মেয়েদের। মেয়েদের জন্য খেলনাবাটি, পুতুল আর ছেলেদের জন্য গাড়ি, রোবট ইত্যাদি উপহার দেওয়া শুরু হল। একটি মেয়ে যে রোবট নিয়ে খেলতে পচ্ছন্দ করবে না বা ছেলেটি রান্নাবাটি খেলবে না এটা আমরাই ঠিক করে দিই। তারা ছোটবেলা থেকে কি খেলবে কেমন আচরণ করবে, কেমন আচরণ করবে না সবটাই

সমাজ ঠিক করে দেয়। এই ঠিক করে দেবার আদলেই তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে উঠতে থাকে। এই বিভাজনের পিছনে কোনো অন্তর্নিহিত সত্য নেই। বাটলার এর মতে সেক্স ও জেন্ডার আমাদের মধ্যে থাকা কোনো অন্তর্নিহিত সত্য নয়। যে আচরণগুলো আমরা প্রতিদিন করি, যে ভাবে হাঁটি, কথা বলি, কাজ করি এই গুলোর মধ্যে দিয়েই নারী পুরুষ হয়ে উঠি। বাটলার এর এই মত সেক্স ও জেন্ডার বিভাজনের যে প্রথাগত কাঠামো তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং নতুন করে, নতুন আলোকে আমাদের ভাবতে শেখায়।

সমাজে এলজিবিটিকিউআইএ+ সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে অনেক ধরণের অভিযোগ উঠে থাকে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল যে প্রকৃতি বাইনারি নিয়ম অনুসরণ করে এবং বিপরীত লিঙ্গের সম্পর্কই একমাত্র স্বাভাবিক বিষয় কেন না তাতে প্রজনন সম্ভব হয় ও মানব জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকে। যারা পুরুষ ও নারীদের মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারছেন না তাদের এই বিষয়টাই অস্বাভাবিক। কুইয়ার ইকোলজির মতো শাস্ত্র সমাজ ও পরিবেশ এর বিভিন্ন ঘটনা কে তুলে ধরে এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় ও এই ন্যারাটিভকে খণ্ডন করেন। তারা প্রশ্ন তোলেন স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দ্বৈত বিভাজনের ভিত্তিটা ঠিক কি? কোনটাকে আমরা স্বাভাবিক ও কোনটা কে অস্বাভাবিক বলব? কোনটা স্বাভাবিক ও কোনটা অস্বাভাবিক এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যেও বহু মতভেদ রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে যেটা বোঝা হয় যে প্রাকৃতিক হল যা প্রকৃতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ থাকে না। অপ্রাকৃতিক হল যা যেটা প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয় এবং যেখানে মানুষ হস্তক্ষেপ করে। অ্যারিস্টটলের মতে প্রত্যেক বস্তুর কিছু স্বরূপ থাকে। যে জিনিসটা সেই স্বরূপ কে বজায় রাখেটাই প্রাকৃতিক। যেমন একটা পাখি তার ক্ষেত্রে ওড়াটাই স্বাভাবিক আর প্রাকৃতিক। একটি পাখির যদি ডানা ছেঁটে দিয়ে তার ওড়া থেকে আটকানো হয় তবে সেটাই হবে অপ্রাকৃতিক। অনেক সময়ই আবার স্বাভাবিক অস্বাভাবিক এর সাথে ভাল--মন্দ এই বিষয়গুলো অদ্ভুত ভাবে যুক্ত হয়ে যায়। প্রায়শই দেখা যায় যা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সাথে কিছু খাপ না খেলেই তা খারাপ, অদ্ভুত, ট্যাবু, অপ্রাকৃতিক বলে ধরা হয়। কি প্রাকৃতিক আর কি নয় তা বেশির ভাগ সময়ই সংস্কৃতি, সমাজ ও সময় ঠিক করে দেয়।

এই ক্ষেত্রে কুইয়ার ইকোলজি বলে সমকামিতা সত্যি প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিনা তা বিচার করতে গেলে আমাদের তাকানো উচিত প্রকৃতির দিকেই। কুইয়ার ইকোলজি দেখায় প্রাণিজগতের বহু প্রজাতি এমন আছে যাদের মধ্যে সমকামী আচরণ দেখা যায় যেমন- বোনোবো, ডলফিন, সিংহ, পেঙ্গুইন, কালো রাজহাঁস, অক্টোপাস ইত্যাদি। এড ওয়াটকিনস তার 'কুইয়ার প্ল্যানেট' ডকুমেন্টারিতে প্রাণিজগৎ এর এমন অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন যার থেকে প্রমাণ হয় যে প্রকৃতির মধ্যে সমকামিতা এক অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।

সমলিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আর একটা যে আপত্তি তোলা হয় তা হল সমলিঙ্গ সম্পর্কের প্রবনতা যদি বাড়তে তাহলে সকল মানুষই একসময় সমলিঙ্গভুক্ত হয়ে যাবে ও মানব জাতি এক সময় অস্তিত্ব সঙ্কটে পরে যাবে। এখন দেখে নেওয়া যাক এই আপত্তি কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রথম কথা এটা কোনো ছোঁয়াচে অসুখ নয় যে একজন মানুষ থেকে আর একজন মানুষে তা ছড়িয়ে পড়বে বা বলা ভালো একজন সমলিঙ্গভুক্ত মানুষের সাথে মিশে একজন বিপরীতলিঙ্গ ভুক্ত মানুষ সমলিঙ্গে পরিনত হবেন। এই ধরনের চিন্তন সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। একজন মানুষ সমকামী বা বিষমকামী হবেন তা নির্ভর করে কিছু জিনগত ও হরমন-এর বৈশিষ্ট্যের ওপর। এটা এমন ব্যাপার নয় যে কেউ কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর যৌন অভিমুখ পরিবর্তন করে ফেলবে। আর আমরা যদি অতীতের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাব অতীতেও পৃথিবী জুড়ে একই রকম ভাবে সমলিঙ্গভুক্ত মানুষেরা ছিলেন এবং তার ফলে মানবজাতি বিলুপ্ত হবার পথে হাঁটে নি বরং পৃথিবীর জনসংখ্যা দিন কে দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন আমরা যদি আমাদের ভারতীয় ঐতিহ্যের দিকে তাকাই তাহলে এরকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারতে দুই মহাকাব্য- রামায়ণ ও মহাভারতে এরকম বহু উদাহরন আমরা পাই। রামায়ণের একটি পর্বে যখন রাম, লক্ষণ ও সীতার সাথে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে যাচ্ছিলেন তখন তাকে এগিয়ে দিতে নগরের বহু মানুষ এসেছিলেন। রাম বনে যাবার আগে তাদের বলে গিয়েছিলেন- হে পুরুষ ও নারীগন আপনারা দয়া করে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান ও নিজ নিজ দায়িত্ব কর্তব্য পালন করুণ। এর পর রাম যখন ১৪ বছর বনবাসের পর যখন ফিরে এলেন তখন দেখলেন কিছু মানুষ তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। রাম অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা তখনো ওখানে কেন দাঁড়িয়ে আছেন? তখন সেই মানুষ গুলো বললেন- রাম বলেছিলেন নারী ও পুরুষদের ফিরে যাবার জন্য। কিন্তু সেই ভিড়ে কিছু মানুষ ছিলেন যারা নিজেদের নারী ও পুরুষ এই দুই এর মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারেননি। তাই কি করবেন বুঝতে না পেরে তারা সেখানেই থেকে

গিয়েছিলেন। এই কথা শোনার পর রাম তাদের অস্তিত্বকে যথাযথ সম্মান জানিয়ে তাদের কে নিজের ঘরে ফিরে যেতে বলেন। এই গল্পটি তে বেশ কিছু বিষয় আছে যা লক্ষ্য করার মত। প্রথমত সমলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ মানুষের উপস্থিতি তখনও ছিল, ছিল বলেই তাদের কথা প্রাচীন সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এবং তাদের উপস্থিতির ফলে মানব জাতি কোনরূপ সঙ্কটে পড়েনি। দ্বিতীয়ত সেই সময়েও মানুষ গুলো নিজ অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগতেন। সমাজের তথাকথিত দ্বিবিভাজন ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজেদের চিহ্নিত করতে না পারার যে যন্ত্রণাটা তখনো ছিল এখনো আছে।

ভারতের প্রাচীন সাহিত্যগুলো তে এরকম আরো অনেক উদাহরন আছে যা প্রাচীন ভারতে সমলিঙ্গ বা লিঙ্গ তরলতার উপস্থিতির কথা বলে। বেশিরভাগ সময়ই পুনর্জন্মের কাহিনি, বিভিন্ন গল্প, ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এই কথাগুলিকে বলা হয়েছে। যেমন মহাভারতে শিখণ্ডী চরিত্রটির কথাই ধরা যাক। মহাভারতে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদ এর কন্যা ছিলেন শিখণ্ডি বা বলা ভাল শিখণ্ডিনী। তিনি একজন নারী হিসাবেই জন্মেছিলেন। শিখণ্ডিনীর আবার পূর্ব জন্মে নাম ছিল অম্বা। অম্বা কাশীর রাজা কাশ্যর জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তার স্বয়ম্ভর সভায় তাকে ও তার বোন অম্বালিকা কে জোর অপহরণ করে নিয়ে যান ভীষ্ম তার ভাই বিচিত্রবীর্যের সাথে বিয়ে দেবার জন্য। ভীষ্ম এই কাজটি হস্তিনাপুরের জন্য রাজনৈতিক বন্ধুত্ব গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু অম্বা জানিয়েছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যেই শাল্বকে স্বামী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটি জানার পর, ভীষ্ম অম্বাকে শাল্বর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। তবে শাল্ব তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কোনো উপায় না পেয়ে অম্বা তখন ভীষ্মের কাছে ফিরে গিয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন এবং তাঁকে বিয়ে করার দাবি জানান। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর ব্রহ্মচর্যের শপথের কারণে অম্বাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। অপমানিত হয়ে অম্বা দীর্ঘ তপস্যা করেন এবং প্রতিশোধ নেবেন বলে পরবর্তীকালে শিখণ্ডীনি নামে পুনর্জন্মগ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দশম দিনে ভীষ্মকে কেউই তাকে পরাজিত করতে পারছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ, শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে নিয়ে আসতে বলেন। ভীষ্ম এক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি কখনো কোনও নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। শিখণ্ডী জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারী হিসেবে, কিন্তু পরে তিনি পুরুষ হিসাবে পরিচিত হন। এই কারণে ভীষ্ম তাকে এখনও নারী বলেই বিবেচনা করতেন। এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে অর্জুন শিখণ্ডীকে ভীষ্মের সামনে রাখেন ও ভীষ্মের দিকে অসংখ্য তীর ছোড়েন, যার ফলে ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে যান এবং শরশয্যায় থাকেন। এই গল্পে শিখণ্ডীর নারী থেকে পুরুষ হয়ে ওঠার কাহিনিটি বিশেষ অর্থবহ আমাদের এই আলোচনায়। শিখণ্ডিনীর বাবা, পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ, অম্বা তথা শিখণ্ডীর ভীষ্মের প্রাতি প্রতিশোধের কথা জানতেন এবং তাই তিনি শিখণ্ডিনীকে পুত্রসন্তান হিসেবে প্রতিপালন করেন। যখন শিখণ্ডিনী বড় হলেন, তার বিয়ে একটি রাজকন্যার সঙ্গে হয়। তবে কিছুদিনের মধ্যেই রাজকন্যা জানতে পারেন যে শিখণ্ডিনী প্রকৃতপক্ষে একজন নারী। অপমানিত হয়ে রাজকন্যার পিতা দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। শিখণ্ডিনী চরম বিপদে পড়ে এবং লজ্জিত হয়ে বনে পালিয়ে যান। শিখণ্ডীর সাথে দেখা হয় এক যক্ষ স্থূণকর্ণ-এর। শিখণ্ডিনীর দুর্দশা দেখে স্থূণকর্ণ দয়া পরবশ হয়ে তাকে সাহায্য করতে রাজি হন। তিনি জাদুশক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে শিখণ্ডিনীকে পুরুষ এবং নিজেকে নারী রূপে রূপান্তরিত করেন। শিখণ্ডিনী তখন একজন পুরুষ রূপে রাজ্যে ফিরে আসেন এবং তার বিবাহিত জীবন পুনরায় গৃহীত হয়। এরপর থেকে তিনি শিখণ্ডী নামে পরিচিত হন। পরে স্থূণকর্ণ নিজের পুরুষ রূপ ফিরে পেতে চাইলে, যক্ষরাজ কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে শাস্তি দেন এবং তার নারীরূপ চিরস্থায়ী করে দেন। ফলে শিখণ্ডী সারা জীবন পুরুষ রূপেই থেকে যান। এই রূপান্তরের মাধ্যমেই শিখণ্ডী তার প্রতিশোধের লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহাভারতের এই শিখণ্ডী চরিত্রের মধ্যে আমরা অদ্ভুত ভাবে নারী ও পুরুষ উভয় শক্তিরই এক মিশেল দেখতে পাই। শিখণ্ডী জন্মেছিলেন মেয়ে হিসাবে অর্থাৎ শারীরিক গঠনগত দিক থেকে তিনি ছিলেন নারী সুলভ, কিন্তু মানসিক দিক থেকে তিনি একজন পুরুষ সত্তা হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারতেন। তার এই ব্যবহার লক্ষ্য করেই হয়ত তার বাবা তাকে একজন ছেলে হিসাবেই গড়ে তুলেছিলেন। পড়ে যখন তার সুযোগ আসে তখন তিনি তার পুরুষ সত্তার দিকটাকেই বেছে নেন। এরকম ঘটনা আমাদের আসে পাশে আমরা দেখেই থাকি। পুরো ঘটনাটাই বর্ণিত হয় পুনর্জন্ম, প্রতিশোধের মধ্যে দিয়ে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বার্তা খুব গভীর। শিখণ্ডীর এই গল্প আমাদের এটাই শিক্ষা দেয় যে সেক্স ও জেন্ডার দুটো এক জিনিস নয়। সেক্স একজন ব্যক্তির জৈবিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে, যেমন- ক্রোমোজোম, হরমোন, প্রজনন অঙ্গ এবং শারীরিক গঠন ইত্যাদি। এই জন্ম থেকেই ব্যক্তি নিয়ে বড় হয় এবং এক্ষেত্রে তার বেছে নেবার কোন জায়গা থেকে না। জেন্ডার ওপর দিকে সমাজ এবং সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত একটি পরিচয়। নারী, পুরুষ, ট্রান্সজেন্ডার, নন-

বাইনারি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম হতে পারে। একজন ব্যক্তি কেমন ব্যবহার করেন, পোশাক পরেন বা নিজেকে প্রকাশ করেন, তা লিঙ্গ পরিচয়ের অংশ। এটি পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তি নিজে এটি বেছে নিতে পারেন। তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে একজন হয়ত একটি পুরুষ দেহের বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহন করেছেন কিন্তু অন্তরে তিনি নারী। এক্ষেত্রে তার মধ্যে নারী ও পুরুষ সত্তা উভয়ই বর্তমান। শিখণ্ডী চরিত্র ক্ষেত্রেও আমরা একই বিষয় দেখতে পাই। তবে এই বিষয়ে যে সবাই এক মত নন তা আমরা আগেই দেখেছি। জুডিথ বাটলার এর মতে যেমন সেক্স ও জেন্ডার উভয়ই সামাজিকভাবে নির্মিত। কিছু জৈবিক মৌলবাদীদের আছেন যাদের মতে আবার সেক্স ও জেন্ডার উভয়ই জৈবিক। যেমন- স্টিভেন পিংকার, সাইমন ব্যারন-কোহেন, যারা মনে করেন জেন্ডার ভূমিকা মূলত জৈবিক পার্থক্য থেকে উদ্ভূত। কোহেন তাঁর বই 'দ্য এসেনশিয়াল ডিফারেন্স'-এ বলেন নারী ও পুরুষের মস্তিষ্কের গঠনগত পার্থক্য থেকেই তাদের আচরণের পার্থক্য আসে। নারীর ও পুরুষের আচরণগত পার্থক্য নিউরোলজিক্যাল বা হরমোনগত কারণে হয়। অনেক আধুনিক গবেষক আবার একটি মধ্যমপন্থা গ্রহণ করতে পছন্দ করেন এই ক্ষেত্রে। তাঁরা বলেন সেক্স জৈবিক ভিত্তি রাখে, তবে সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে এর অর্থ প্রদান ও ব্যাখ্যা করা হয়। একজন মানুষের জেন্ডার গঠনের ক্ষেত্রে জৈবিক প্রভাব থাকলেও তার পাশাপাশি সমাজ, সংস্কৃতি, তাঁর বেড়ে ওঠা, তাঁর নিজস্ব ব্যাক্তি চেতনা এগুলো খুব গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একজন শিশুর জন্ম হতে পারে পুরুষ থাকে বা নারী শরীর নিয়ে, কিন্তু সে সমাজে কীভাবে মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে তা ভিন্ন হতে পারে। এই ভিন্নতাকেই আমাদের সম্মান জানানোটা জরুরি।

ভারতবর্ষের এর ক্ষেত্রে বিষয়টা হল সমকামিতা ভারতের ইতিহাসে বরাবরই ছিল। খাজুরাহো, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর—এই মন্দিরগুলিতে বিভিন্ন যৌন সম্পর্ক, সমকামী সম্পর্ক, লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রকাশ দেখা যায়। বিভিন্ন গল্প, মহাকাব্যে এর উল্লেখ আছে। তবে এমন নয় যে এই সময় এই মানুষগুলোর কোনো সংগ্রাম ছিল না। যেমন মনুস্মৃতিতে সমকামী যৌন আচরণকে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শ্লোকে বলা হয়, যদি একজন কুমারী নারী আরেক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে, তাহলে তার শরীরকে শুদ্ধ করতে নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশোচনা করতে হবে। সমকামিতাকে দোষ, অপরাধ হিসাবে দেখার বিষয়টা প্রাচীন ভারতেও ছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের সময় ১৮৬১ সালে সেকশন ৩৭৭ অনুসারে প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনাচার কে আইনের চোখে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা শুরু হয়। তবে সারা পৃথিবী জুড়েই অবস্থা এখন বদলাছে। ২০০৯ দিল্লি হাইকোর্ট, ২০১৩ তে সুপ্রিম কোর্ট এবং ২০১৮ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সেকশন ৩৭৭ ধারাকে অবৈধ ঘোষণা করে। পৃথিবীর বহু দেশে সমকামিতা এখন স্বীকৃত। মানুষ আস্তে আস্তে তার বাইনারি চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নন বাইনারি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করছে।

যদিও এই পথ খুব সোজা নয়। বাইনারি চিন্তাধারা নিয়ে বেড়ে ওঠা একজন মানুষের পক্ষে নন বাইনারি ওয়ার্ল্ড ভিউ কে রাতারাতি গ্রহন করা সহজ না। সাদা কালোর মাঝে গ্রে শেডটাকে ধরতে অনেক সময় লাগে এবং তা নিরন্তর মানসিক অনুশীলনেরও বিষয়। আমরা যেখান থেকে শুরু করতে পারি তা হল নিজেরা সচেতন হবার মধ্যে দিয়ে। আমরা যখন বড় হয়ে উঠি আমাদের মধ্যে অনেক ধরনের পক্ষপাত ও পূর্বধারণা নিয়ে বড় হয়ে উঠি যা সমাজ আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত নিজেদের এই পক্ষপাত গুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা। প্রকাশ্য পক্ষপাত সম্পর্কে মানুষ সচেতন হলেও মানুষের অবচেতনে এমন কিছু গোপন পক্ষপাত থাকে যেগুলো সম্পর্কে সে নিজেই জানে না। এই পক্ষপাত গুলি নিয়ে নিজের মধ্যে সচেতনতা আনা প্রয়োজন। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় সবাই কোনো না কোনো রকমের গোপন (ইমপ্লিসিট) পক্ষপাত নিয়ে বড় হয়। ইমপ্লিসিট বায়াস টেস্ট করার জন্য কেউ ইমপ্লিসিট অ্যাসোসিয়েশন টেস্ট দিতে পারেন যা আমাদের অচেতন পক্ষপাত ধরতে সাহায্য করে। যদি কেউ স্বীকার করতে পারে হ্যাঁ, আমার এই জায়গায় সমস্যা আছে, আমার পক্ষপাত আছে কিছু জায়গায়, তাহলে তার অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। নিজেকে পরিবর্তনের পথটা খুলে যায়। এর সাথে সাথে যা করতে হবে তা হল বিপরীত চিত্রগুলোর সংস্পর্শে থাকতে হবে। আমাদের মস্তিষ্ক যা বারবার দেখে, সেটাই স্বাভাবিক ভাবে ধরে নেয়। যদি মস্তিষ্ক বারবার দেখে যে সমকামী মানুষরাও সাধারণ জীবন যাপন করে, তখন অন্যরকম ভাবাটা কমে যায়। এই পদ্ধতিকে বলে কাউন্টার স্টিরিটাইপ ট্রেনিং। পক্ষপাত কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সেই গোষ্ঠীর মানুষদের সাথে অর্থবহ, আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। শুধু চেনা নয়, গভীরভাবে জানা। তখনই আমরা বনাম তারা ভাবটা ভেঙে গিয়ে মানবতাবোধ টাই বড়ো হয়ে দাড়ায়। পক্ষপাতমুক্ত অভ্যাস গড়তে হলে নিজের চারপাশও পরিবর্তন করতে হবে এবং এটা একদিনের বিষয় নয়। আমরা নিজেদের মধ্যে এই

পরিবর্তন আনতে পারলে তবেই পরবর্তী প্রজন্মকে সেই শিক্ষা দিতে পারব। তারা এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলবে যেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ ও তাদের মধ্যের পার্থক্যগুলো দমন করা হয় না। বরং তাকে গৌরবের সাথে গ্রহণ ও উদযাপন করা হয়।

তথ্যসূত্র:

১. বোরাল, সৌরভ ও বসিষ্ঠ, দিব্যা। ডিলিনিয়েশন অফ থার্ড জেন্ডার আইডেন্টিটি ইন দ্য ইন্ডিয়ান এপিকস অ্যান্ড আদার এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়ান টেক্সটস। আইআইএস ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস, ২০২৩।
২. বাটলার, জুডিথ। জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভার্শন অব আইডেন্টিটি। রউটলেজ, ১৯৯০।
৩. ফুকো, মিশেল। দ্য হিস্টরি অব সেক্সুয়ালিটি। পেঙ্গুইন ইউ কে, ১৯৯৮।
৪. ফিউচারচার্চনাও। "দ্য বাইবেল অ্যান্ড সেম সেক্স রিলেশনশিপস- পার্ট ৬: লেভিতিকাস- দ্য হোলিনেস কোড, এন্সিয়েন্ট সেক্স এথিক্স অ্যান্ড আবমিনেশনস"। ২০১৫, অগাস্ট ১৮ https://www.futurechurchnow.com/2015/08/18/the-bible-and-same-sex-relationships-part-6-leviticus-the-holiness-code-ancient-sex-ethics-and-abominations/
৫. হালবারস্ট্যাম, জ্যাক। ইন আ কুইয়ার টাইম অ্যান্ড প্লেস: ট্রান্সজেন্ডার বডিজ, সাবকালচারাল লাইভস। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৫।
৬. নন্দা, সেরেন। নাইদার ম্যান নর ওম্যান: দ্য হিজড়াস অব ইন্ডিয়া। ওয়াডসওয়ার্থ পাবলিশিং, ১৯৯০।
৭. সেডউইক, ইভ কোসোফস্কি। এপিস্টেমোলজি অব দ্য ক্লোজেট। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৯০।
৮. শ্রীনিবাসন, এস. পি. "ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম ইন হিন্দু মিথলজি" কারেন্ট মেডিসিন অ্যান্ডবায়োলজি, ২০২০ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC753902/
৯. ভানিতা, রূথ। কুইয়ারিং ইন্ডিয়া: সেম-সেক্স লাভ অ্যান্ড ইরোটিসিজম ইন ইন্ডিয়ান কালচার অ্যান্ডসোসাইটি। রউটলেজ, ২০০২।
১০. ওয়াটকিন, এলিসন। কুইয়ার প্ল্যানেট ডকুমেন্টারি। বিবিসি স্টুডিওস, ২০১৮।